দেওয়া হয়। ফলে কর্নওয়ালিস যখন শাসনভার নেন তখন খাজনা আদায়ের পুরো প্রশাসনিক কাঠামোটি সমস্যার মুখে পড়েছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন বাংলায়ও জমিদারদের উন্নতি হোক। তাঁর ধারণা ছিল জমিদারদের সম্পত্তির অধিকারকে স্থায়ী ও নিরাপদ করা হলে তাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করবেন। তাছাড়া অগণিত কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করার বদলে কম সংখ্যক জমিদারের থেকে খাজনা আদায় করা পদ্ধতি হিসেবে অনেক সহজ ছিল। পাশাপাশি জমিতে অধিকার স্থায়ী করার মাধ্যমে জমিদারদের কোম্পানির অনুগত গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছিল। এসব কারণে ১৭৯৩

খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির তরফে জমিদারদের সঙ্গে খাজনা আদায় বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমি জমিদারি সম্পত্তি হয়ে পড়ে। সমস্ত জমিতে নির্দিষ্ট কর ঠিক করা হয়। জমিদার সময় মতো সেই নির্ধারিত কর কোম্পানিকে দিতে পারলেই ঐ জমিতে তাঁর অধিকার স্থায়ী

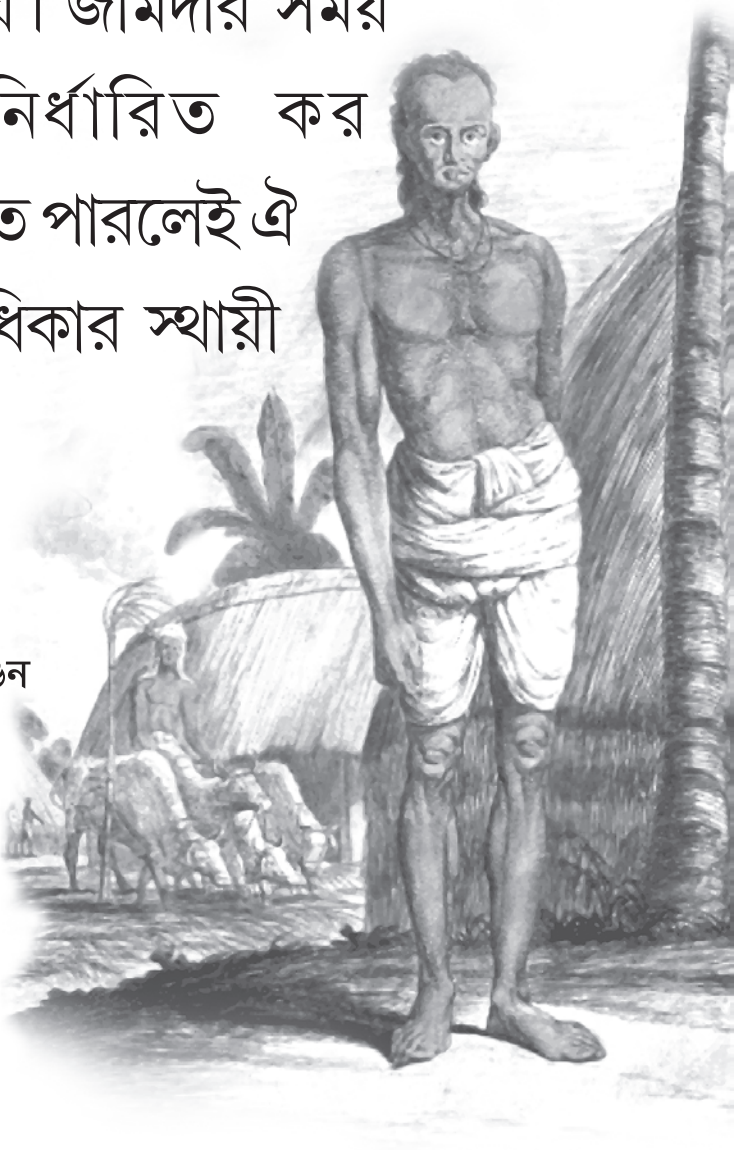

বাংলার কৃষক। মূল রঙিন ছবিটি ফ্রাঁসোয়া বালথাজার সলভিন্স-এর আঁকা (১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ)।

হতো। তাছাড়া ঐ জমির উপর জমিদারের চূড়ান্ত অধিকার ছিল। সেই অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রেও বজায় থাকত। জমি বিক্রি করতে বা হাত বদল করতেও পারতেন জমিদারেরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত খাজনা জমা দিতে না পারলে জমিদারের জমি কোম্পানি কেড়ে নিত। সেই জমি নিলাম করে নতুন কোনো ব্যক্তির হাতে জমিদারির অধিকার তুলে দেওয়া হতো। এইভাবে জমি ক্রমেই জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে উঠেছিল। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল এর মাধ্যমেই জমিদারদের স্বার্থ ও কৃষির উন্নতি — দুইই নিশ্চিত করা যাবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের সমৃদ্ধি বাড়লেও কৃষকের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

কৃষকরা জমিদারের অনুগ্রহ-নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন। প্রাক্- ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকেরও জমির উপর দখলি স্বত্ব ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকের স্বত্বকে খারিজ করে তাদের প্রজায় পরিণত করা হয়।

উঁচু হারে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কৃষকের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপত। তাছাড়া প্রায়ই নানান আবওয়াব বা বেআইনি কর আদায় করা হতো কৃষকদের থেকে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট খাজনা দিতে না পারলে কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারও জমিদারকে দেওয়া হয়। ফলে নানা দিক থেকে চাপে পড়ে কৃষকের অবস্থার অবনমন হতে থাকে।

চড়া হারে কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করা জমিদারের পক্ষে সমস্যা ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকেরা চড়া হারে খাজনা দিতে পারতেন না। তাই রাজস্ব দিতে না পারার কারণে জমিদারদের জমি নিলামে উঠত। বাস্তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে কোম্পানির কর্তৃত্ব ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে দৃঢ় হয়েছিল।

টুকরো কথা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব : বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।.... জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ

করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।....

.....

....ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই ‘‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’’ বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র---কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত ‘‘চিরস্থায়ী’’।

কর্ণ্ওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন--- জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য

কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, "প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনারেল্ যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"

"বিধিবদ্ধ করিবেন" আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না।"

[উদ্ধৃতাংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

টুকরো কথা

সূর্যাস্ত আইন

জমিদারদের পক্ষেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি সমস্যার দিক ছিল। আপাতভাবে জমির অধিকার জমিদারের দখলে থাকলেও, বাস্তবে সমস্ত জমির চূড়ান্ত মালিকানা কোম্পানির হাতেই ছিল। নির্দিষ্ট একটা তারিখের মধ্যে প্রাপ্য রাজস্ব কোম্পানিকে জমা দিতে হতো। এই ব্যবস্থা সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত ছিল। নির্দিষ্ট তারিখে সূর্য ডোবার আগেই প্রাপ্য রাজস্ব কোম্পানিকে জমা দিতে না পারলে জমিদারের সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার কোম্পানির ছিল।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে কোম্পানি-শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ঐ অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। ততদিনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পর্কে কোম্পানির অনেক আধিকারিকের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া মাদ্রাজ অঞ্চলে বড়োমাপের জমিদার বিশেষ ছিল না। ফলে সেখানে ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত সরাসরি কৃষকের সঙ্গেই করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। সেক্ষেত্রে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব জমিদারদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার দরকার হতো না। তাছাড়া কৃষক বা রায়তকে জমির মালিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের উপর

জন শোর (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম উৎসাহী ব্যক্তি)

জমিদারের অত্যাচারকে এড়ানো যাবে বলে মনে করা হতো। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের শর্ত ছিল ঠিক সময়ে রায়তকে ভূমি-রাজস্ব জমা দিতে হবে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কিছু অংশে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করা হয়। তবে ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হয় নি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজস্বের পরিমাণ সংশোধন করা হতো। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে স্থানীয় জমিদারের বদলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অধীনে চলে যেতে থাকে কৃষক সমাজ।

বাস্তবে জমিতে কৃষকের কোনো মালিকানা বা অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। কৃষকরা আসলে

ফিলিপ ফ্রান্সিস (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম উৎসাহী ব্যক্তি)

ঔপনিবেশিক শাসকের ভাড়াটে চাষি হিসাবে জমিতে চাষের অধিকার পেয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন সময়মতো রাজস্ব দিতে না পারলে জমি থেকে তাঁদের উৎখাত করে সেই জমি অন্য কৃষককে দিয়ে দেওয়া হবে। কার্যত ঔপনিবেশিক প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছিল যে, রায়তের প্রদত্ত ভূমি-রাজস্ব কর নয়, খাজনা। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক অংশেই সেই খাজনার হার ছিল উঁচু। কোথাওবা মোট উৎপাদনের ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ খাজনা নেওয়া হতো। এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলেও খাজনার হারে রদবদল করা হতো না।

মহলওয়ারি ব্যবস্থা

থমাস মানরো (রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম উৎসাহী ব্যক্তি)

মহল কথাটির একটা অর্থ কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। ফলে মহলওয়ারি বলতে আদতে গ্রামভিত্তিক বোঝানো হতো। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত এলাকার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করা হয়েছিল। এই বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার মহলের জমিদার বা প্রধানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। অবশ্য সেই চুক্তির মধ্যে গোটা গ্রাম সমাজকেই ধরা হয়েছিল।

মহলওয়ারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও কৃষক সমাজের বিশেষ সুরাহা হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর

রাজস্ব-হার সংশোধন করা হতো। ফলে প্রায়ই উঁচু হারে রাজস্ব ধার্য করা হতো। অতএব রাজস্বের বাড়তি বোঝা, তা মেটাতে ধার করা, ধার শোধ দিতে না পারায় অত্যাচার— এসবেরই মুখোমুখি হতে হতো কৃষকদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাতে জমিগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ রাজস্বনীতির প্রভাব

বস্তুত দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজস্ব বিষয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রধানত তিন ধরনের বন্দোবস্ত চালু করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় জমিদারদের সঙ্গে। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত করা

হয় রায়ত বা চাষির সঙ্গে এবং মহলওয়ারি বন্দোবস্ত করা হয় গ্রামের সম্প্রদায়ের সঙ্গে। তিনটি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক নানা হেরফের দেখা গিয়েছিল। তবে আদতে ব্রিটিশ কোম্পানি-শাসনের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। তার ফলে সবথেকে বেশি চাপ বেড়েছিল কৃষক সমাজের উপরে। সেই চাপের ফলে ক্রমেই দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য দেখা যেতে থাকে। বস্তুত দেখা গিয়েছিল যেসব অঞ্চলে রাজস্ব বন্দোবস্ত অস্থায়ী ছিল, সেখানে কৃষকরা বেশি সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। তবুও বেশি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজস্ব হার সংশোধনের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখে।

বস্তুত, দেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক ভূমি-রাজস্বনীতি ও বন্দোবস্তগুলির নানারকম প্রভাব পড়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিদারিগুলিতেও কৃষকের অবস্থা বিশেষ ভালো হয়নি। জমির ও কৃষির উন্নতি তথা কৃষকের জীবনযাপনের উন্নয়নে জমিদাররা বিশেষ উদ্যোগ নিতেন না। বরং বাংলার গ্রাম- সমাজে কৃষকদের নানাভাবে হেনস্থা করার উদাহরণ প্রবল হয়ে ওঠে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

টুকরো কথা

বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা : অক্ষয়কুমার দত্ত-র আলোচনা

"...."যে রক্ষক সেই ভক্ষক" এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামি স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহারদের দারিদ্র্য দশা, শীর্ণ শরীর ম্লান বদন, অতি মলিন চীরবসন কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না—

কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারিবিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্ব্বাণি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন।....

.....

....নায়েব আর গোমস্তা নিতান্ত নির্ম্মায়িক হইয়া প্রজাদের উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে। ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্ব্বেই আপন আপন ভাগ গ্রহণ করে, এবং সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম ছল পাইলেই প্রজার ধন হরণ করিতে থাকে।....”

[উদ্ধৃত অংশটি অক্ষয়কুমার দত্ত-র ‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা’ প্রবন্ধের থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের অধীন কৃষকদের অবস্থাও খুব একটা আলাদা ছিল না। বরং জমিদারদের বদলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনই সেখানে শোষকের ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পগুলি ধ্বংসের মুখে পড়ায় ক্রমশ জমির আয়ের উপর বেশি মানুষ নির্ভর করতে শুরু করেন। ফলে জীবিকা হিসাবে কৃষিতে চাপ বেড়েছিল। পাশাপাশি, জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরাও গ্রামগুলিতে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে থাকে। তার ফলে গ্রামের গরিব কৃষককে ঔপনিবেশিক শাসক ও দেশীয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলির চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফলে গ্রাম-সমাজে আরেকরকম বদলও ঘটেছিল। তা হলো পুরোনো অনেক জমিদাররা তাঁদের অধিকার

হারিয়েছিলেন। অনেক নতুন ব্যবসায়ী, মহাজন ও শহুরে পেশার মানুষেরা গ্রামে জমিদারি কিনে নিয়েছিলেন। ফলে গ্রামের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বদল ঘটেছিল। পুরোনো জমিদারদের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক নতুন জমির মালিকদের ক্ষেত্রে বদলে গিয়েছিল। তাছাড়া নতুন জমির মালিকেরা অনেকেই তাঁদের জমিদারিতে বাস করতেন না। ফলে, জমির ও কৃষির উন্নতি তথা কৃষকের ভালোমন্দ নিয়ে তাঁদের বিশেষ ভাবনাচিন্তা ছিল না। কেবল কর্মচারীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রতি তাঁদের মনোযোগ ছিল।

টুকরো কথা

মহাজনি ব্যবস্থা

ঔপনিবেশিক আমলে গ্রাম- সমাজে মহাজনদের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। বেশি হারে নগদ রাজস্বের

দাবি মেটাতে চাষিরা মহাজনের থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিত। নানা ক্ষেত্রেই কৃষকের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে মহাজনরা হিসাবের কারচুপি ও জালিয়াতি করে সুদ আদায় করে যেত। তাছাড়া কোম্পানির নানা আইনের ফলে ক্রমে মহাজনরাই জমির দখল নিতে শুরু করে। আইন-ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাত মহাজনরা। ফলে, মহাজনি ব্যবস্থা ও মহাজন ক্রমেই গ্রামের কৃষকের আক্রমণ ও বিরোধিতার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মহাজনি ব্যবস্থা ও মহাজনদের উপরে আক্রমণ।

মহাজনের কবলে দরিদ্র মানুষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ

ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয় অর্থনীতির আরেকটি দিক ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। অর্থাৎ, বাণিজ্যের কাজে প্রয়োজন বিভিন্ন কৃষিজ ফসল চাষের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব পড়েছিল। যেমন, চা, নীল, পাট, তুলো প্রভৃতি ফসল চাষ করার জন্য কৃষকের ওপর জোর দিয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকার। বস্তুত রেলপথ বানানো, রফতানির হার বাড়ানো ও কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে 'অর্থনীতির আধুনিকীকরণ' বলে ব্যাখ্যা করা হতো।

এখন প্রশ্ন হলো আদৌ কী ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল? প্রসঙ্গত বলা চলে কৃষিজ

উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাবার জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে বিশেষ উদ্যোগ ছিল না। কয়েকটি ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য কয়েকটি খাল খনন করা হয়েছিল। অবশ্য ঐ অঞ্চলগুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল না। ফলে ঐসব খাল খননের বদলে জমির খাজনার হার বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন। তবে সরকারি সেচ ব্যবস্থা ছিল চাহিদার তুলনায় সামান্য। সেচ ব্যবস্থার আসল সুবিধা পেত তুলনায় ধনী কৃষকেরা। কারণ, খালের জল ব্যবহারের জন্য উঁচু হারে কর দেওয়ার সামর্থ্য কেবল তাদেরই ছিল। বাস্তবে গরিব কৃষিজীবীদের সমস্যার

কোনো সমাধানই হয়নি। তারা বড়ো জমিদার ও কৃষকের অধীনে ভাগচাষি হিসাবেই কাজ করতে বাধ্য হতো। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়েনি। ফলে ঔপনিবেশিক ভারতে দুর্ভিক্ষ ছিল ঘটমান বর্তমান।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভারতীয় কৃষকসমাজে পারস্পরিক ভেদাভেদ তৈরি হয়েছিল। কৃষির আধুনিকীকরণের সঙ্গে মূলধন জোগাড় করা ও বাজারের চাহিদা মতো কৃষিজ ফসল উৎপাদনের বিষয়গুলি জড়িত ছিল। অথচ নানা কারণে এই বিষয়গুলিতে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হতো না। ফলে কৃষির উন্নতি যা হতো, তাতেও কৃষকের সরাসরি লাভ বিশেষ হতো না। মূলধন

বিনিয়োগকারীই বেশিরভাগ মুনাফা করতেন। পূর্ব ভারতে নীলচাষকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নীল চাষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানি সরকার প্রত্যক্ষ উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দশ জন নীলকরকে চাষের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়েছিল। সেই নীলকররা বাংলায় নীল চাষে উদ্যোগী হন। কোম্পানি অবশ্য বাগিচা কৃষি হিসাবে নীলচাষের বিষয়টা ভাবেননি। কারণ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জমি কেনার বিষয়ে নীলকরদের কোনো অধিকার ছিল না। ফলে নীলকররা প্রথমে স্থানীয় কৃষকদের নীলচাষের জন্য রাজি করাতে চেষ্টা করে। অবশ্য তাতে কাজ না হলে জোর করে অগ্রিম টাকা বা দাদন দিয়ে চাষিদের বাধ্য করা হতো নীলচাষ করতে। এরই ফলে নীলচাষের বিষয়কে ঘিরে

বাংলার অনেক অঞ্চলেই কৃষকের সঙ্গে নীলকর ও কোম্পানির সংঘর্ষের পথ তৈরি হতে থাকে।

নীলের চাষ পুরোটাই করা হতো ইংল্যান্ডের কাপড় কলে নীলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে। কিন্তু এই সময় রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল তৈরি করা শুরু হয়। ফলে নীলের চাহিদা সবসময় এক থাকত না। তাছাড়া ক্রমেই নীলচাষ করার জন্য দমন-পীড়ন করা শুরু হয় চাষিদের উপরে। তারই ফলে বাংলায় নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-'৬০ খ্রিস্টাব্দ) ঘটেছিল।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলে কী কী ফসল চাষ হয়? সেগুলির কোনটা কোনটা খাদ্যশস্য? কোনটা বাণিজ্যিক শস্য? তোমার স্থানীয় অঞ্চলের একটি ফসল-মানচিত্র তৈরি করো।

টুকরো কথা

বাগিচা শিল্প

নীলচাষ ছাড়াও বিভিন্ন বাগিচা শিল্পে ইউরোপীয়দের উৎসাহ ছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আসাম, বাংলা, দক্ষিণভারত ও হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে চা- বাগিচা শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। চা-বাগিচার মালিকানা বিদেশি হাতে থাকায় সেইসব জমিগুলির জন্য ঔপনিবেশিক সরকার কর ছাড় দিয়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য নানা সুযোগ- সুবিধাও পেত বাগিচা শিল্পগুলি। ক্রমে বিদেশে রফতানির ক্ষেত্রে চা একটি প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতে কফি বাগিচারও বিকাশ হয়।

অবশ্য বাগিচা শিল্পগুলির বিকাশে ভারতীয়

জনগণের বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা হয়নি। কারণ বিদেশি মালিকানাধীন ঐ শিল্পের যাবতীয় মুনাফা দেশের বাইরে চলে যেত। আর বেতনের বেশির ভাগটাই পেত বিদেশি কর্মচারীরা। উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বিদেশের বাজারে বিক্রি করে তার অর্থ ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হতো।

বাংলার একটি নীল-কারখানা। মূল ছবিটি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা।

অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয় কৃষক কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। তাহলে প্রশ্ন তৈরি হয় যে, ভারতীয় কৃষক সমাজের উপরে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের কী প্রভাব পড়েছিল? বাস্তবে কৃষি-উন্নতির বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধাটাই আর্থিকভাবে শক্তিশালী কৃষিজীবীরা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাই তার সুফলটুকুও তাঁরাই পেয়েছিলেন। অধিকাংশ কৃষকেরই অবশ্য এর ফলে কোনো লাভ হয়নি। বিরাট সংখ্যক কৃষকের পক্ষে কৃষির উন্নতির জন্য ভালো গবাদি পশু, উন্নত বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রাজস্বের চড়া হারের ফলে কৃষি থেকে কৃষকের উপার্জন কম হতো। বস্তুত, কৃষিজাত লাভের বেশিটাই

ঔপনিবেশিক সরকার, জমিদার ও মহাজনদের হাতে চলে যেত। ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে কৃষক-স্বার্থরক্ষার কোনো বিশেষ নীতি ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক ক্রমেই কৃষি শ্রমিক বা ভাগচাষিতে পরিণত হয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অতিরিক্ত ঋণের ভারে কৃষকরা প্রায়ই দাসে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলায় অনেক কৃষক জমি হারিয়ে ভাগচাষি বা বর্গাদারে পরিণত হন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে রেলপথ বসানোর জন্য প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা খরচ করেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। অথচ ঐ পর্যায়ে কৃষিতে জলসেচের কাজে খরচ করা হয়েছিল ৫০ কোটি টাকারও কম। যদিও রেলপথের থেকে জলসেচের উন্নতিতে ভারতের বেশি মানুষ লাভবান হতো।

দেশীয় অনেক বুদ্ধিজীবী এই যুক্তিতে ইংরেজ সরকারের রেলপথ প্রকল্পকে সমালোচনাও করেছিলেন।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রভাবে কার্পাস তুলোর চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। তার ফলে দাক্ষিণাত্যে কার্পাস তুলোর চাষ বেড়ে যায়। কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর দাক্ষিণাত্যে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুলোর দাম একদম কমে যায়। তার উপরে চড়া হারে রাজস্বের চাপ ছিল কৃষকের উপর। সেই সময় খরা ও অজন্মার ফলে কৃষকসমাজ চূড়ান্ত দুর্দশার মুখে পড়েছিল। সেই দুর্দশার সুযোগ নিয়েছিল স্থানীয় সাহুকার মহাজনেরা। সাহুকারেরা

চাষিদের ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করত। এর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের তুলো চাষিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাহুকারদের আক্রমণ করে তাদের দখলে থাকা কাগজপত্রগুলি পুড়িয়ে দেয় বিদ্রোহী চাষিরা। আহমদনগর ও পুনা জেলায় বিদ্রোহ তীব্র আকার নিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলা ঐ বিদ্রোহকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন 'দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা' নাম দিয়েছিল।

টুকরো কথা

আসামের চা বাগান ও শ্রমিক অধিকার

বাগিচা শিল্পের শ্রমিক হিসেবে স্থানীয় লোকদের নিয়োগ করা হতো। সামান্য মজুরি ও চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে কাজ করতে হতো ঐ শ্রমিকদের। ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসামের চা বাগানের

শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। নিজের চোখে আসামের চা-বাগানগুলি ঘুরে দেখে শ্রমিকদের উপর ইউরোপীয় মালিকদের অত্যাচারের খবর সঞ্জীবনী পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। সেই সময় দ্বারকানাথের সঙ্গী রামকুমার বিদ্যারত্নও ধারাবাহিক ভাবে সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'কুলী-কাহিনী' নিবন্ধ লিখতে থাকেন। দ্বারকানাথ ও রামকুমারের উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত দেশের লোকের ও ঔপনিবেশিক শাসকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের হয়ে লড়াই করার সেটি অন্যতম পুরোনো নজির।

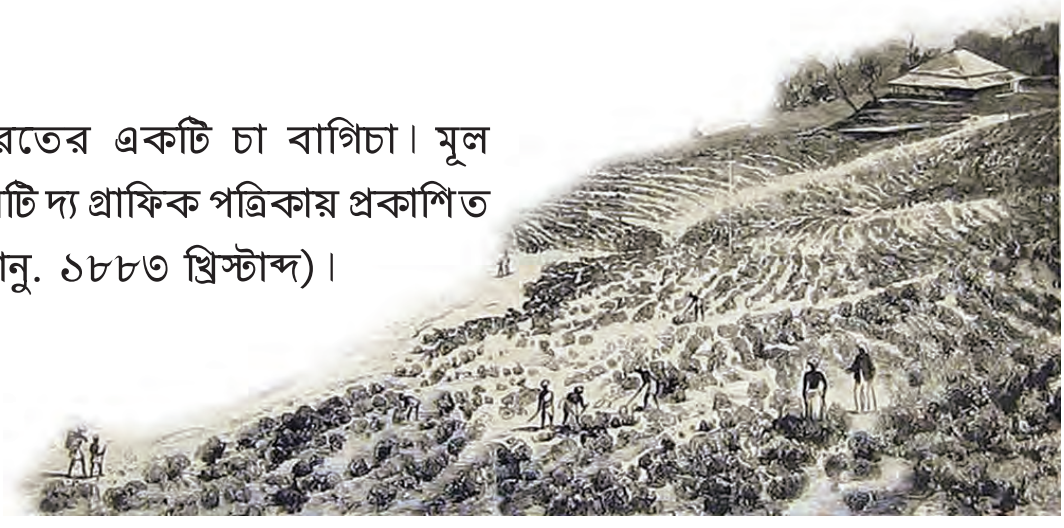

ভারতের একটি চা বাগিচা। মূল ছবিটি দ্য গ্রাফিক পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে কৃষকদের জন্য আইন

দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহগুলির ফলে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে Agriculturists' Relief Act (কৃষকদের সুবিধার জন্য আইন) জারি করে ঔপনিবেশিক প্রশাসন। ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল ঋণগ্রস্ত চাষিদের উপর থেকে অত্যাচারের বোঝা কিছুটা কমানো। ধার শোধ করতে না পারলে চাষিদের গ্রেফতার আটক করা নিষিদ্ধ হয়। তার বদলে গ্রামেই বিচার সভা বসিয়ে সাহুকার ও চাষিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা উপর জোর দেওয়া হয়।

একই ভাবে বাংলায়ও জমিদারের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের Tenancy Act (প্রজাস্বত্ব আইন) অন্যতম। ঐ আইন মোতাবেক অস্থায়ী রায়তদের দখলি স্বত্ব দেওয়া হয়। সেখানে স্পষ্ট বলা হয় আদালতের পরোয়ানা ছাড়া কোনো রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। খাজনা বাড়ানোর সময়ও জমিদারকে নির্দিষ্ট কারণ দর্শাতে আদেশ দেওয়া হয় ঐ আইনে। তবে দাক্ষিণাত্যে এবং বাংলায় বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিক ও ভাগচাষিদের স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর ছিল না ঔপনিবেশিক প্রশাসনের।

শিল্প-বাণিজ্য-শুল্কনীতি

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবেই কাজ করত। দামি ধাতু, নানারকম জিনিসপত্র তারা ভারতে আমদানি করত। তার বদলে কোম্পানি মশলাপাতি ও কাপড় রফতানি করত ব্রিটেনে।

কিন্তু, ব্রিটেনের বস্ত্র উৎপাদকরা কোম্পানির এই রফতানিতে খুশি ছিল না। তারা ব্রিটেনের সরকারকে চাপ দিতে থাকে যাতে ব্রিটেনে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রি আইন করে বন্ধ করা হয়। সেই মোতাবেক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে আইন করে

ব্রিটেনে সুতির কাপড় ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, অন্যান্য কাপড় আমদানির উপরেও চড়া শুল্ক চাপানো হয়েছিল। কিন্তু, এ সব প্রতিরোধ সত্ত্বেও আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ছিল।

কলকাতার কাছে গঙ্গা নদীতে নৌ-পরিবহনের একটি দৃশ্য। মূল ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ডে কাপড় শিল্পে নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানো ও দ্রব্যের মান ভালো করা হতে থাকে। অন্যদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জায়গায় চলে যেতে থাকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাংলার রাজস্বের অর্থ খরচ করে কোম্পানি ভারতীয় দ্রব্য রফতানি করত। তার পাশাপাশি, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশীয় বাণিজ্যের শুল্কনীতি নির্ধারণ করতে শুরু করে ব্রিটিশ কোম্পানি। বাংলার তাঁতিদের সস্তায় দ্রব্য বিক্রি করতে বা কোম্পানির বেঁধে দেওয়া দাম মেনে নিতে বাধ্য করা হতো। এর

ফলে তাঁত শিল্পে ক্ষতি হতে শুরু হয়। অনেক তাঁতি সামান্য মজুরিতে কোম্পানির হয়ে বস্ত্র উৎপাদন করতেন। ভারতীয় ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশি বণিকদের ভারতের বাজার থেকে হঠিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি।

তাছাড়া বাংলার হস্তশিল্পীদের তৈরি জিনিস যাতে বেশি দামে কেনা না হয় তার জন্যেও নজরদারি রাখত ব্রিটিশ কোম্পানি। কাঁচা সুতো বিক্রির ব্যবসায় কোম্পানির একাধিপত্য তৈরি হয়েছিল। তার জন্য বাংলার তাঁতিদের চড়া দামে কাঁচা সুতো কিনতে হতো। চড়া দামে কাঁচামাল কেনা ও সস্তা দামে তৈরি দ্রব্য বিক্রিতে বাধ্য হওয়ার ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একদিকে বিদেশের বাজার হারিয়েছিল ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, অন্যদিকে দেশের ভিতরে বিদেশি পণ্যের সঙ্গে তাদের পাল্লা দিতে হয়েছিল। দু-দিক থেকে আক্রান্ত ভারতীয় বস্ত্র ও হস্তশিল্প এর ফলে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্রমেই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বদলে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে পড়ে।

টুকরো কথা

অবশিল্পায়ন

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের বাজারের একচেটিয়া অধিকার চলে যায়। সেই সময়

থেকেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন ব্রিটিশ পণ্য ভারতে আমদানি করা হতে থাকে। তার ফলে নানারকম বৈষম্যমূলক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে ভারতের দেশীয় শিল্পগুলি ক্রমে ধ্বংস হতে থাকে। ভারতীয় শিল্পের অবলুপ্তির ঐ প্রক্রিয়াকে অবশিল্পায়ন বলা হয়। ব্রিটেনে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্প ক্রমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঐ শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন ধরনের মানুষ তার ফলে জীবিকাহীন হয়ে পড়েন।

বিপুল সংখ্যক কর্মচ্যুত শিল্প শ্রমিক ও কারিগররা জীবিকার জন্য কৃষিকাজে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তার ফলে কৃষি অর্থনীতির উপরেও বাড়তি চাপ

পড়ে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিদেশি পণ্যে আরও বেশি করে ভারতের বাজারগুলি ছেয়ে গিয়েছিল। ফলে বিভিন্ন দেশীয় শিল্পের অবনমন ঘটে। তাঁত, কাঠ ও চামড়ার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ ঐ জীবিকাগুলি ছেড়ে দিয়ে সহজ লাভের আশায় রেলপথ ও রাস্তা বানানোর শ্রমিক হয়ে গিয়েছিলেন।

অবশ্য অবশিল্পায়ন নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকার কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি। ভারতীয় অর্থনীতির উপর অবশিল্পায়নের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা করেছিলেন।

স্পষ্টতই বোঝা যায় ব্রিটিশ অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রভাব ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতির উপরে নেতিবাচক ছিল। যেসব ভারতীয় দ্রব্য তখনও ব্রিটেনে জনপ্রিয় ছিল সেগুলির উপরে চড়া হারে শুল্ক বসানো হতে থাকে। সেই শুল্ক ততক্ষণ বাড়ানো হতো, যতক্ষণ ঐ দ্রব্যের রফতানি বন্ধ না হয়ে যায়। এসবের ফলে ক্রমেই তৈরি দ্রব্য রফতানির বদলে কাঁচামাল

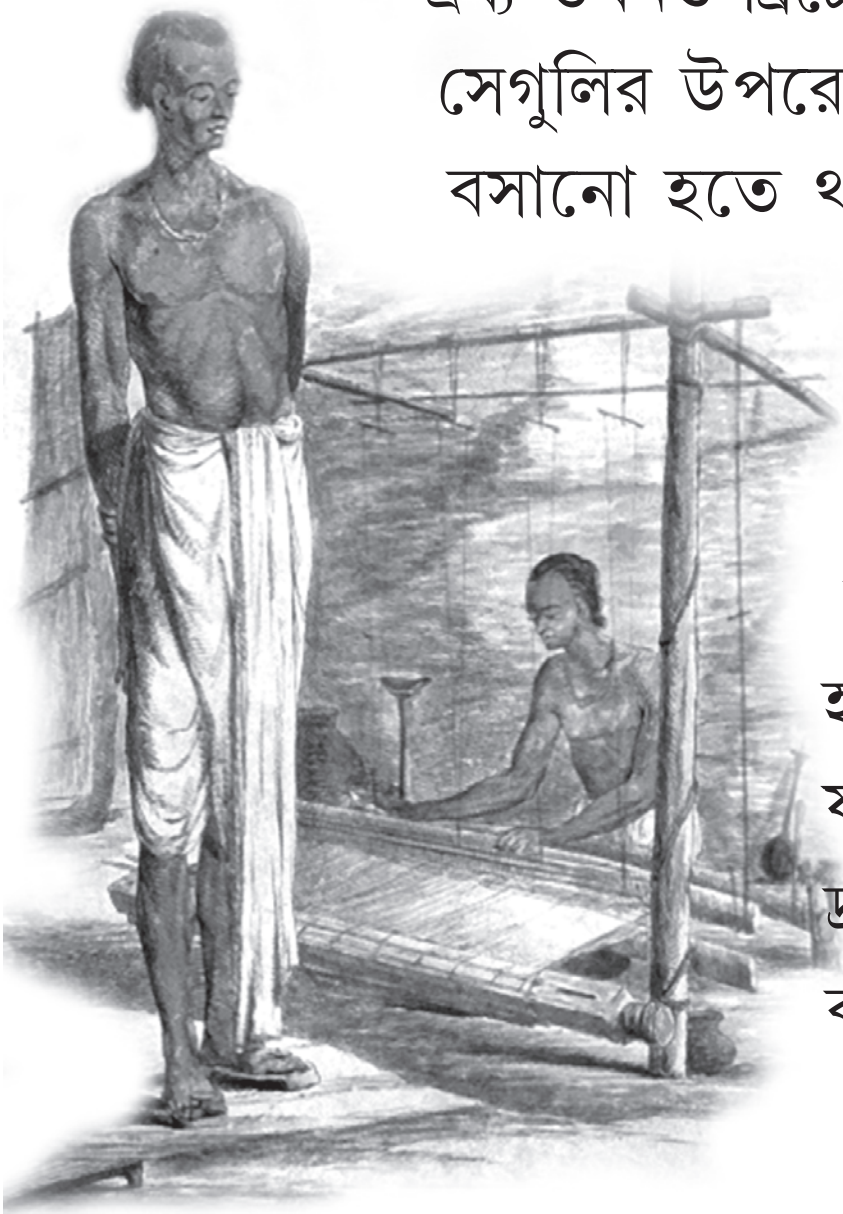

বাংলার তাঁতি। মূল ছবিটি ফ্রাঁসোয়া বালথাজার সলভিন্স-এর আঁকা।

রফতানি করা হতে থাকে ভারত থেকে। তার ফলেই ভারতের নীল, চা প্রভৃতি ব্রিটেনে রফতানি করা হয়। সেইগুলি ব্রিটেনে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কদর পেতে থাকে।

কাঁচামাল রফতানির ক্ষেত্রে কাঁচা সুতো ছিল অন্যতম প্রধান। সেই সুতোর তৈরি কাপড় ব্রিটিশরা ভারতের বাজারে আমদানি করত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে পর থেকেই ব্রিটেনের শিল্প-চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের শিল্পনীতি নির্ধারিত হতে থাকে। উপনিবেশ হিসাবে ভারতবর্ষ ক্রমেই কাঁচামালের রফতানি ও ব্রিটেনে তৈরি দ্রব্যের আমদানির বাজারে পরিণত হতে থাকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ভারতীয় বাজারকে বিস্তৃত করে ব্রিটিশ পণ্য চলাচল সুগম করে

তুলেছিল। বিশেষত রেলপথের প্রসার ঘটার সঙেগ সঙেগ গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের হাল খারাপ হতে থাকে। বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলির ভেতরে গ্রামীণ হস্তশিল্পের চাহিদা ছিল। কিন্তু রেলপথের মাধ্যমে গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পড়ার ফলে গ্রামের স্থানীয় বাজারেও ব্রিটিশ দ্রব্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ পণ্যদ্রব্যগুলি পিছু হঠতে থাকে।

হস্তশিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে অনেকগুলি শহরও ক্রমে আগের জৌলুশ হারাতে থাকে। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সুরাট প্রভৃতি শহরগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামগ্রিকভাবে শহরের জনসংখ্যা কমেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। পাশাপাশি, কাজ হারানো শিল্পী ও কারিগরেরা চাষের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাতে কৃষির

উপরেও চাপ বাড়ে। সেই চাপ সামলাবার মতো সামর্থ্য কৃষির ছিল না। ফলে ভারতে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে পড়ে।

টুকরো কথা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'রত্ন'

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে পরবর্তী দেড় শতকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পরে বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় খরচ ভারত থেকেই আদায় করতে হবে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ভাবে ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। ভারতের বাজার ব্রিটিশ পণ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনের ল্যাঙ্কাশায়ারে

তৈরি সুতির কাপড়ের ৮৫ শতাংশ ভারতে বিক্রি হতো। ভারতীয় রেলের ব্যবহৃত লোহা ও ইস্পাতের ১৭ শতাংশ আসত ব্রিটেন থেকে। অর্থাৎ, উপনিবেশ হিসাবে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অভিমুখ শাসক ব্রিটেনের স্বার্থেই পরিচালিত হতো। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতকেই সবচেয়ে দামি 'রত্ন' হিসাবে বর্ণনা করা হতো।

উপনিবেশ হিসেবে ভারতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক নীতিকে ব্যঙ্গ করে আঁকা একটি ছবি। মূল ছবিটি ইংল্যান্ডের পাঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ)।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে বেশ কিছু যন্ত্র-নির্ভর শিল্প তৈরি হতে থাকে। ১৮৫০ এর দশকে সুতির কাপড়, পাট ও কয়লা শিল্প তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম সুতির কাপড় তৈরির কারখানা চালু হয়। হুগলির রিষড়ায় প্রথম পাটের কারখানা চালু হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ধীরে ধীরে সুতির কাপড় ও চটকল শিল্পে অনেক লোক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হতে থাকে। বিংশ শতকের গোড়ায় চামড়া, চিনি, লৌহ-ইস্পাত ও বিভিন্ন খনিজ শিল্প গড়ে উঠতে থাকে।

এই সব শিল্পগুলিতে বেশিরভাগ ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ হতো। সস্তার শ্রমিক ও কাঁচামাল এবং চড়া হারে মুনাফা ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে। ভারত ও আশেপাশের দেশগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির বাজারও ছিল। তাছাড়া

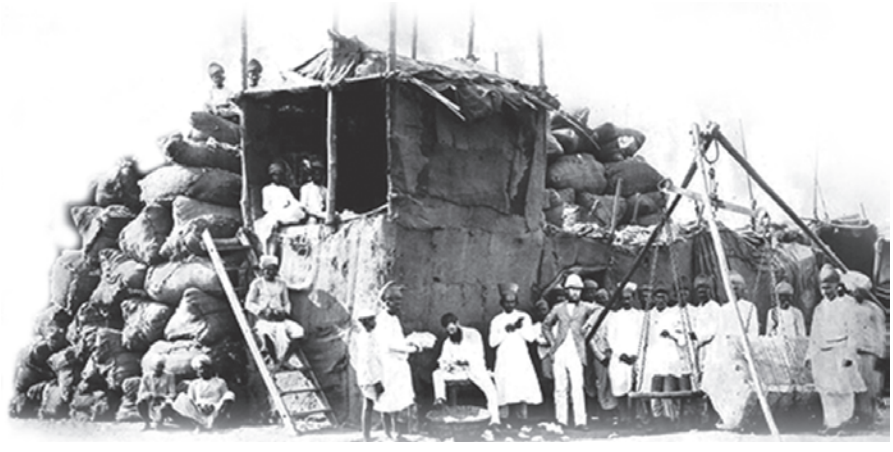

বোম্বাইয়ের একটি তুলোর আড়ত। মূল ফটোগ্রাফটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তোলা।

ঔপনিবেশিক সরকারও ঐ শিল্পগুলিকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল। তবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা সেই সহযোগিতা পাননি। কেবল সুতির কাপড় তৈরির শিল্পে অনেক ভারতীয় বিনিয়োগকারী ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়ার অথবা ব্যাঙ্কের সুদের হারের ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। ধীরে ধীরে অবশ্য দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

সরকারের পরিবহন ও রেল ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঐ বৈষম্য লক্ষ করা যেত। দেশীয় দ্রব্য পরিবহনের জন্য রেল মাশুলের হার ছিল চড়া। বরং বিদেশি দ্রব্য আমদানি করে কম খরচে বিভিন্ন বাজরে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা ছিল। এসবের ফলে ঔপনিবেশিক ভারতে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি মূলত সুতি ও পাট শিল্পে আটকে ছিল। এমনকি ব্রিটিশ উৎপাদকেরা ঔপনিবেশিক সরকারকে

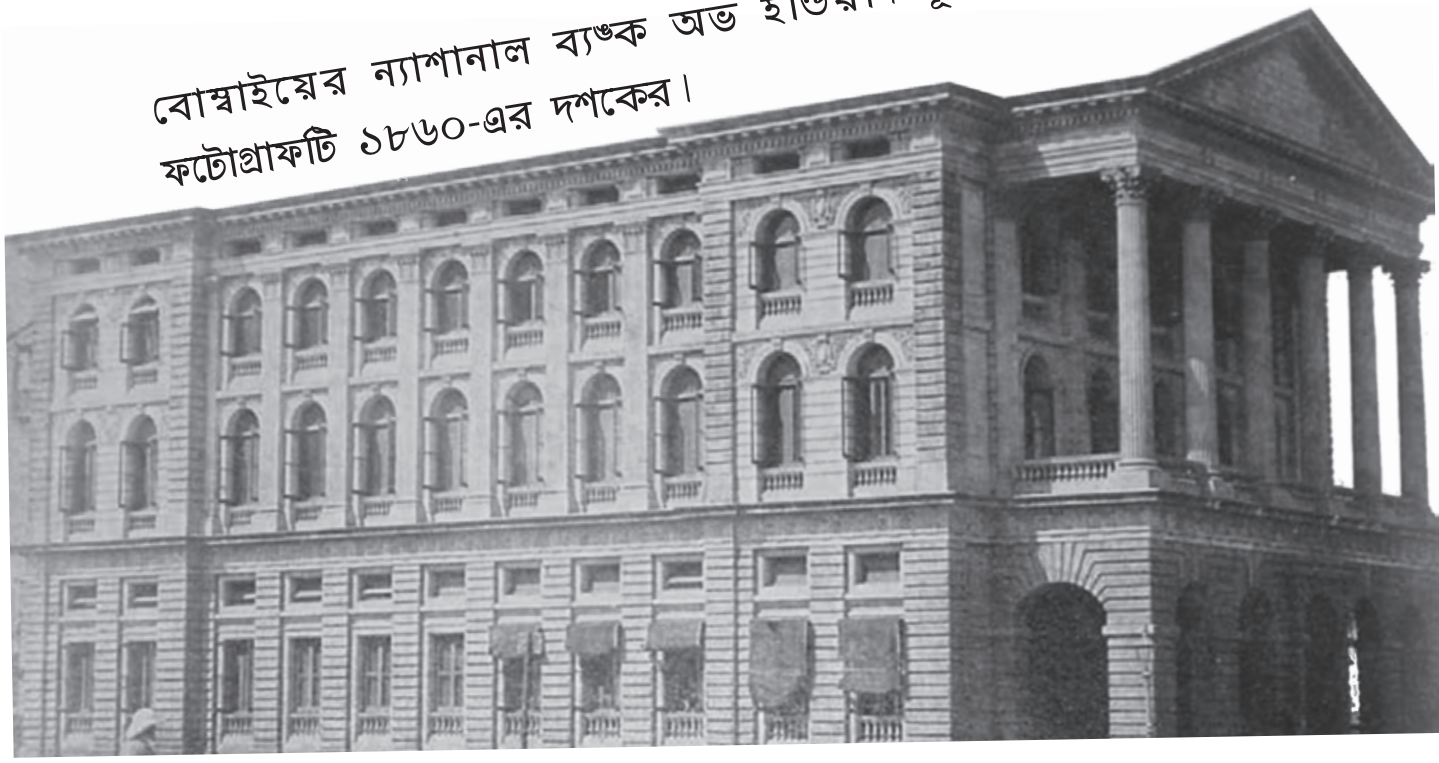

বোম্বাইয়ের ন্যাশানাল ব্যঙ্ক অভ ইন্ডিয়া। মূল ফটোগ্রাফটি ১৮৬০-এর দশকের।

দেশীয় শিল্প-বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যেত। তাছাড়া দেশীয় শিল্পোদ্যোগগুলি কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সার্বিক শিল্পায়নের সুবিধা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষে দেখা যায়নি।

রেলব্যবস্থা

ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রতীক ছিল রেলব্যবস্থা। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন এলাকা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তবে রেলপথ বানানোর পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আদতে ভারতের উন্নতির কারণে রেলপথ বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। বরং ঔপনিবেশিক শাসনকে গতিশীল করাই ছিল রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য।

হুগলিতে রেল চলাচল বিষয়ক একটি ছবি।

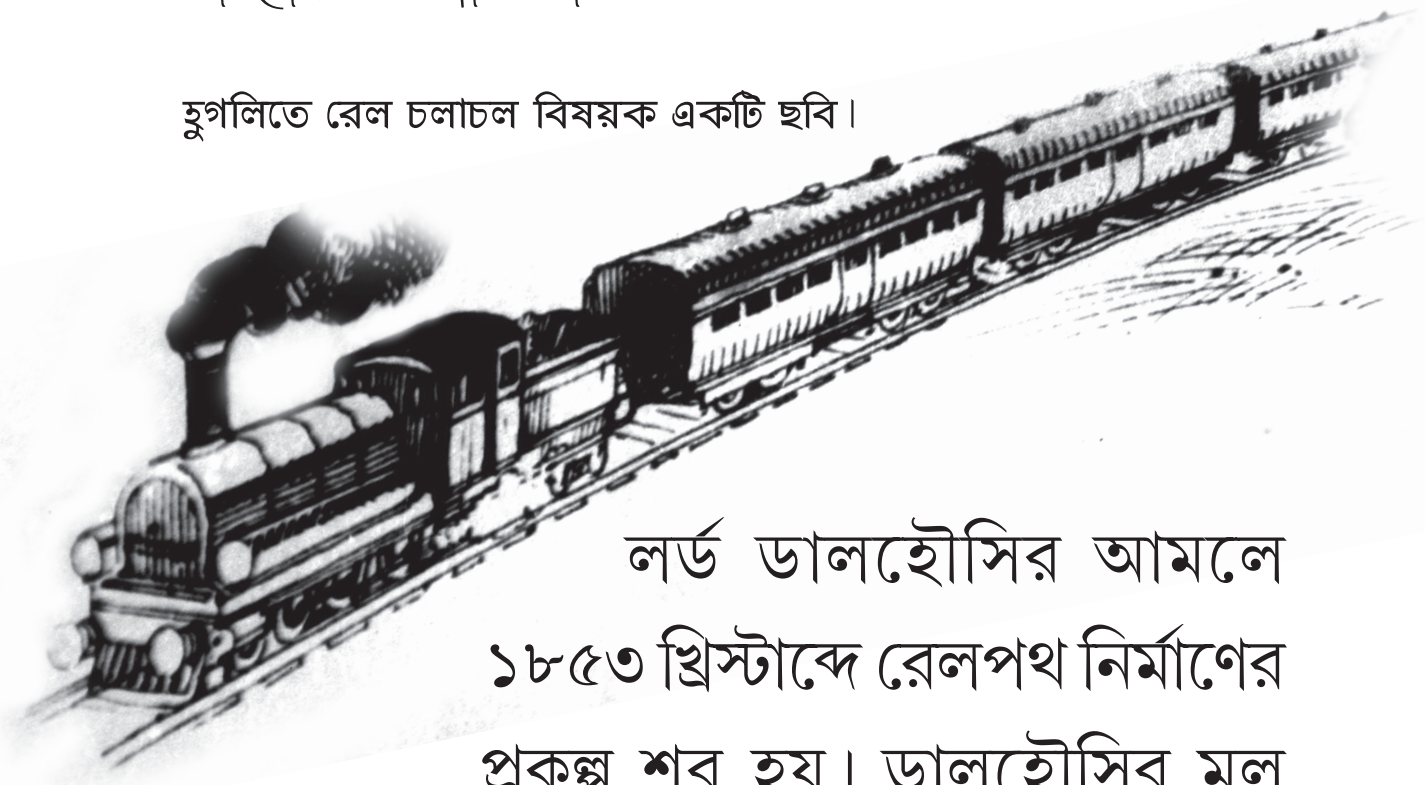

লর্ড ডালহৌসির আমলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প শুরু হয়। ডালহৌসির মূল উদ্দেশ্য ছিল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দ্রুত সেনাবাহিনীর যাতায়াত নিশ্চিত করা। পাশাপাশি বন্দর, শহর ও বিভিন্ন বাজার এবং কাঁচামাল উৎপাদনের জায়গাগুলিকে রেলপথ দিয়ে সহজে যুক্ত করার পরিকল্পনাও ছিল। তার ফলে ভারতের বাজারকে ব্রিটিশ পণ্যের বাণিজ্যের উপযোগী করে তোলা সহজ হতো।

রেলপথ নির্মাণের ব্যয়বহুল প্রকল্পে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে উপনিবেশের রাজস্ব থেকে পাঁচ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। যেসব কোম্পানিগুলি রেলপথ বানানোর দায়িত্ব পেয়েছিল তাদের নিরানব্বই বছরের চুক্তিতে জমি দেওয়া হয়েছিল। সেই জমিগুলি থেকে রাজস্ব নেওয়া হতো না। বলা হয়েছিল, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে রেলপথ ব্রিটিশ সরকারের দখলে চলে যাবে। যদিও মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময় কোম্পানিগুলি রেলপথ সরকারকে ফেরৎ দিয়ে মূলধন বাবদ যাবতীয় খরচ সরকারের কাছে দাবি করতে পারত। সেক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্পটি বিভিন্ন কোম্পানির মূলধন বিনিয়োগের আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ফলে ১৮৫৮ থেকে

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭ কোটি পাউন্ডেরও বেশি মূলধন ভারতের রেলপথ নির্মাণের কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

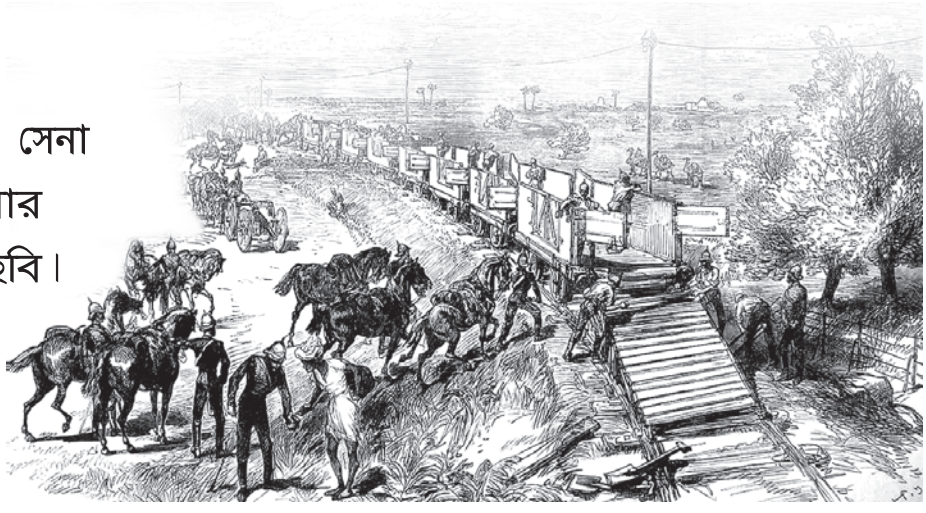

রেলপথের সেনা পাঠানোর একটি ছবি।

উপনিবেশের আর্থিক উন্নয়নের বদলে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষাই রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচুর ব্রিটিশ পণ্য বন্দরগুলি থেকে দেশের ভিতরের বাজারগুলিতে রেলপথের সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া হতো। তার জন্য ভাড়া লাগত খুবই কম। অথচ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে রফতানির জন্য পণ্য বন্দরে আনতে হলে রেলে অনেক বেশি

ভাড়া লাগত। সেইভাবেই কাঁচামাল পরিবহনের ক্ষেত্রেও রেলভাড়ার বৈষম্য ছিল।

ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্পের ফলে ব্রিটেনের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছিল। রেলপথ বানানোর সমস্ত সরঞ্জাম, লোহা এমনকি কিছুদিন পর্যন্ত কয়লাও ব্রিটেন থেকে নিয়ে আসা হতো। রেলপথ নির্মাণ সংক্রান্ত সাধারণ প্রযুক্তিগুলি ভারতীয়দের শেখানো হতো। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিগুলি প্রয়োগ করার জন্য বিদেশ থেকে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হতো। ফলে রেলপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে উন্নত প্রযুক্তি শিক্ষা থেকে ভারতীয়দের সচেতন ভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া রেলপথ বসাতে গিয়ে স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থার ক্ষতি হতো। ফলে নানারকম সংক্রামক ব্যাধি রেলপথের সঙ্গে

ছড়িয়ে পড়েছিল। রেলপথ নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক গাছ ও জঙ্গল কাটা পড়ে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়েছিল। তাছাড়া অরণ্যবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রেলপথ নির্মাণকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ রেলপথ বসাতে গিয়ে তাঁদের জমি, জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদাকে আঘাত করা হয়েছিল। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি অসন্তোষের একটি কারণ ছিল রেলপথ নির্মাণ।

রেলপথ বানানো নিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধ। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ)।

নিজে করো

একটি হিসেব অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রতি মাইল রেললাইন বসাতে নাকি ২০০০ টি স্লিপার লাগত। যদি পাঁচটি স্লিপার বসাতে গড়ে একটি প্রমাণ মাপের গাছ কাটা হয়, তাহলে প্রতি মাইল স্লিপার পিছু কতগুলি গাছ কাটা হয়েছিল? এর ফলে পরিবেশের উপর রেলপথের কী প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়?

টুকরো কথা

রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ভারতে রেলচলাচল চালু হওয়ার পরে রেলে চড়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই রকম একটি অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় মহানন্দ চক্রবর্তীর

একটি বর্ণনা থেকে। বর্ণনাটির নাম 'রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা'। সেই লেখায় মফফ্সল থেকে রেলযোগে কলকাতায় যাওয়ার একটি চমৎকার বিবরণ রয়েছে। অনেকদিনের আয়োজনের পর কলকাতা যাওয়ার জন্য রেলে চাপতে চলেছেন মহানন্দ। তার বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি: "দশ ঘন্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি।/ইষ্টিশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি।।/.... হেনকালে জয়ঘন্টা বাজে আচম্বিতে।।/ঘন্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া।/

.....

ঘন্টা বাজাইয়া তারা দিল বিসর্জন।/মহাশব্দ করি পুন করিল গমন।।/পাশ হইতে নদনদী নগর এড়াইয়া।।/....ভাদ্র পদমাসে যেন নদী

বেগমান্।/ সেইরূপ যায় নাই করয়ে বিশ্রাম।।/ বৈদ্যবাটী ফরাসডাঙ্গা শ্রীরামপুর এড়ায়।/দশ ঘন্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায়।।”

[মহানন্দ চক্রবর্তীর লেখার অংশগুলি চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ‘রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

রেলপথে পশু-পরিবহন। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ)।

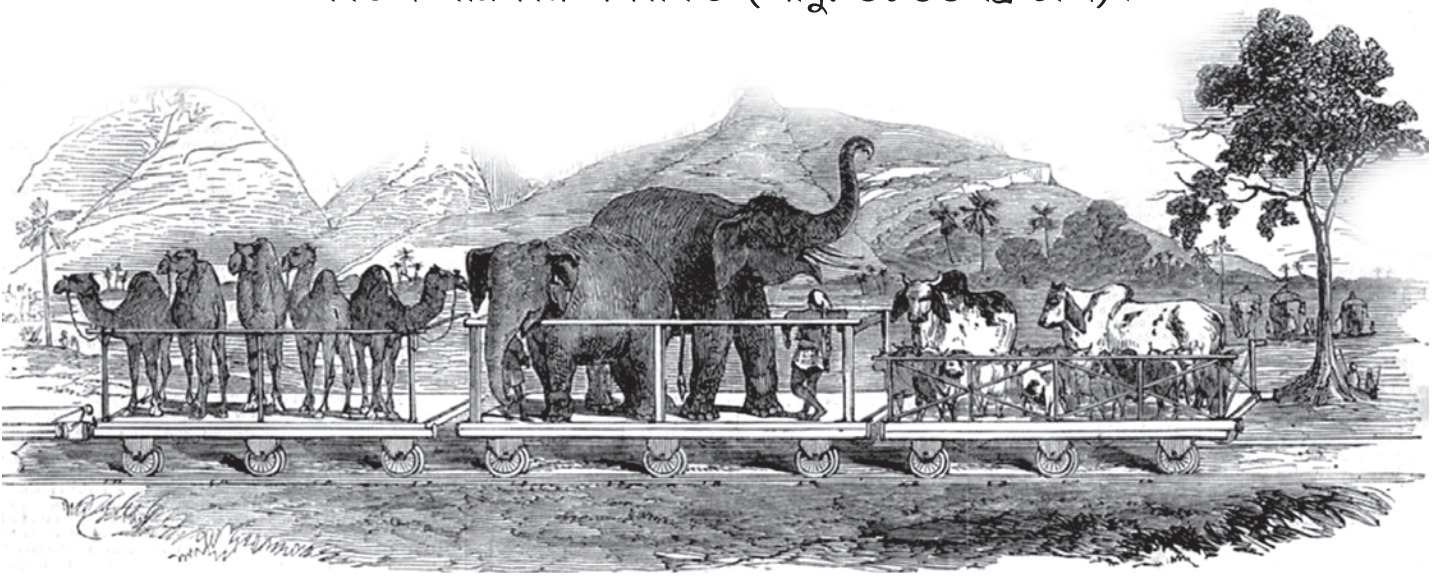

রেলপথ নির্মাণ ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে কতটা জরুরি, তা নিয়ে নানারকম মত ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন রেলপথের বদলে প্রশাসন যদি সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে নজর দিত তাতে সমাজের অনেক বেশি উপকার হতো। তাছাড়া ভারতের রাজস্ব থেকে রেলপথ নির্মাতা কোম্পানিগুলিকে সুদ দেওয়ার বিষয়টিও অনেকেই সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, এর ফলে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাই দেশীয় সমাজে রেলপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তবে বাস্তবে রেলপথ নির্মাণ ভারতের বাজারগুলিকে অনেক পরিমাণেই একজোট করেছিল। পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজতর হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নিজে করো

সম্প্রতি কলকাতায় টেলিগ্রাফ অফিস বন্ধ হয়ে গেল। তোমার স্থানীয় অঞ্চলের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে একটা চার্ট বানাও।

ঔপনিবেশিক ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রেলপথের মতোই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন টেলিগ্রাফ প্রযুক্তির ব্যবহারকে জরুরি করে তোলে। বস্তুত রেলপথ ও টেলিগ্রাফের বিস্তার সহগামী হয়েছিল। রেলপথ বরাবর টেলিগ্রাফ লাইন তৈরি করা হয়। এমনকি

টেলিগ্রাফের মাধ্যমে রেল স্টেশনগুলির মধ্যে যোগাযোগ করা প্রয়োজন হতো। তার মধ্যে দিয়ে রেলের সিগন্যাল ব্যবস্থা কার্যকর করা যেত। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মাত্র কয়েক মাইল জুড়ে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ চালু হয়। তবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে ৪৬টি টেলিগ্রাফ কেন্দ্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৪ হাজার ২৫০ মাইলেরও বেশি অঞ্চল টেলিগ্রাফ যোগাযোগের আওতায় এসে গিয়েছিল। তার ফলে কলকাতা থেকে আগ্রা এবং উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলি এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ওটাকামুন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিস্তৃত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৭ হাজার ৫০০ মাইল এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ৫২ হাজার ৯০০ মাইল জুড়ে

ছড়িয়ে পড়েছিল টেলিগ্রাফ লাইন।

টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশের পিছনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত জরুরি সংবাদ ও তথ্য অতি দ্রুত শাসনকেন্দ্র- গুলিতে পৌঁছানোর দরকার ছিল। সেই কাজে টেলিগ্রাফ সবথেকে বেশি সহায়ক ও নির্ভরযোগ্য ছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের সময় (এপ্রিল, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনের পরাজয়ের খবর কলকাতায় বসে লর্ড ডালহৌসি টেলিগ্রাফের মারফতই পেয়েছিলেন। এমনকি বলা হতো যে, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ থেকে ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করেছিল। দূরদূরান্ত থেকে বিদ্রোহের সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোয় টেলিগ্রাফের মধ্যেমে পৌঁছে যেত।

টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা দ্রুতই ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রশাসকের মতো ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ ক্রমেই টেলিগ্রাফের সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে শুরু করে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে টেলিগ্রাফ যোগাযোগের বিকাশ হয়। তার ফলে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য ভারতবর্ষের উপর আরও জোরাল হয়েছিল।

বাংলার ডাকহরকরা। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ)।

সম্পদের বহির্গমন

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতীয় অর্থনীতির চরিত্রের প্রসঙ্গটি মূলত তিনটি বিষয়কে ঘিরে বিতর্ক তৈরি করেছিল। যেগুলি হলো— সম্পদ নির্গমন, অবশিল্পায়ন ও দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য। এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের তরফে ঔপনিবেশিক সরকারের সমালোচনা করা হয়। বলা হতে থাকে, পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতের সম্পদকে ব্রিটেনের স্বার্থে ব্যবহার ও ব্রিটেনে স্থানান্তরিত করে চলেছে। পাশাপাশি, অসম শিল্প-বাণিজ্য ও শুল্কনীতি ভারতের শিল্প ও কারিগরি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলে। অতএব, এই দু'য়ের ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে দারিদ্র্য ও

দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যগুলিকে যুক্তি ও তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে হাজির করা হয়েছিল।

উপনিবেশ হিসেবে ভারতের সম্পদকে ব্রিটেনে নানাভাবে স্থানান্তরিত করা হতো। তার প্রতিদানে অবশ্য ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতো না। এই ভাবে দেশের সম্পদ বিদেশে চালান হওয়াকেই 'সম্পদের বহির্গমন' বলে উল্লেখ করা হতো। সম্পদের এই বহির্গমন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বস্তুত সুলতানি ও মুঘল আমলেও দেশের জনগণের থেকে রাজস্ব আদায় করে শাসন ব্যয় চালানো হতো। কিন্তু, তার ফলে দেশীয় কৃষি ও বাণিজ্য ভেঙে পড়েনি বা বন্ধ হয়ে যায়নি। এর অন্যতম কারণ, সুলতানি ও মুঘল শাসকেরা ভারতীয় উপমহাদেশেই স্থায়ীভাবে

থাকতেন। অন্য কোনো দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল না। এদিক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বরাবরই কোম্পানির ও সর্বোপরি ব্রিটেনের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কাজ করত। ফলে, তাদের কাজের যাবতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটেনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। আর তার জন্য আবশ্যক ছিল ভারতের অর্থ ও সম্পদ ব্রিটেনে স্থানান্তরিত করা।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রিটিশ আধিকারিকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ভারত থেকে বছরে ২-৩ কোটি স্টার্লিং মূল্যের সম্পদ ব্রিটেনে যেত। যদিও তার বিনিময়ে ভারত সামান্য দামের কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ছাড়া কিছুই পেত না। বাস্তবে ভারতে সম্পদ বহির্গমনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন ‘স্পঞ্জের মতো’

কাজ করত। ভারত থেকে সম্পদ শুষে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও সম্পদ নির্গমন চলেছিল। বস্তুত ঐ শতক শেষ হওয়ার সময়ে ভারতীয় জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের ১/৩ অংশ সম্পদ নির্গত হয়ে যেত। হিসাবে দেখা গেছে ঐ কালপর্বে ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ২ শতাংশ ছিল ভারত থেকে নির্গত সম্পদ।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের সমসাময়িক)।

ভারতের দারিদ্র্য

সম্পদের বহির্গমন ও অবশিল্পায়নের যৌথ ফলাফল হিসেবে ঔপনিবেশিক ভারতে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বেড়েছিল। অবশ্য এই বিষয় নানান রকম মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণ বিচারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের দুর্ভিক্ষগুলি দারিদ্র্যের প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমিক দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষগুলিতে সরকারি সাহায্যের পরিমাণও ছিল যৎসামান্য। ১৮৫৪খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা অনেক ব্রিটিশ আধিকারিকও মেনে নিয়েছিলেন।

একটি সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল প্রায় ৪কোটি ভারতবাসী আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়। ভারতের দারিদ্র্যের পিছনে ঔপনিবেশিক নীতিকেই মুলত দায়ী করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতির ফলেই সামাজিকভাবে দারিদ্র্য স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

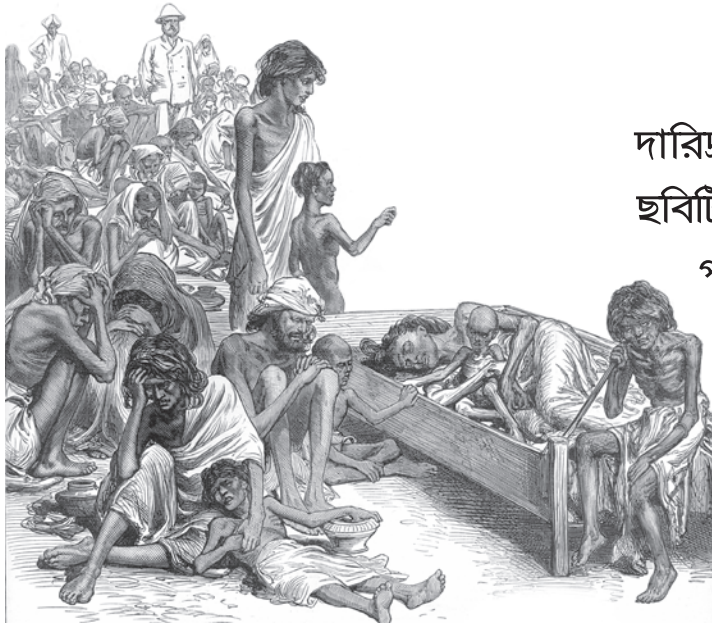

দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবাসী। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের উন্নয়ন: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে

‘‘আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, ... এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ..... কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে— বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে